স্বতঃসিদ্ধগুলো একদম ভেঙে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ বক্রতলের ক্ষেত্রে কিন্তু দু'টি আপাত সমান্তরাল রেখা কোনও বিন্দুতে মিলতে পারে, কিংবা ত্রিভুজের ত্রিকোণের সমষ্টি ১৮০° চেয়ে কম বা বেশি হতে পারে। নীচের ছবিটি দেখলে পাঠকের কাছে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হবে।

আইনস্টাইন এই সমদেশ জ্যামিতি গ্রসম্যানের কাছ থেকে শিখে অবশেষে মহাকর্ষের এক নতুন তত্ত্ব উপহার দিলেন ১৯১৫ সালে। যে তত্ত্বের সাহায্যে আইনস্টাইন মহাকর্ষের সাথে আপেক্ষিকতার যুগলবন্দী ঘটালেন তাকে বলা হলো 'আপেক্ষিকতার ব্যাপক বা সাধারণ তত্ত্ব' (General Theory of Relativity)। তিনি দেখালেন যে, মহাকর্ষকে শূন্যস্থানে দু'টি বস্তু কণার মধ্যে শুধু আকর্ষণ হিসেবে বিবেচনা করাই যথেষ্ট নয়, যেমনটি নিউটন ভেবেছিলেন, ভাবতে হবে 'আপাত বল' (apparent force) হিসেবে যার উদ্ভব হয় আসলে মহাশূন্যের (Space) নিজস্ব বক্রতার কারণে। স্থানের এই বক্রতাকে

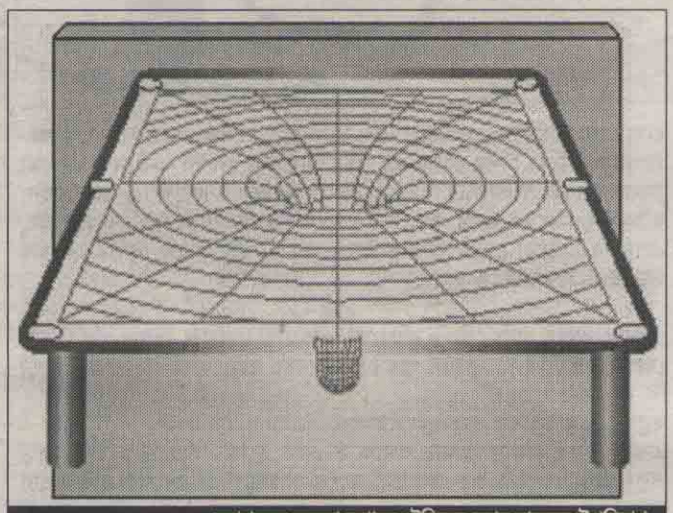

মহাশূন্যের বক্রতা বুঝাতে টেবিলের রবার-চাদরের উপরিভাগ

বুঝবার জন্য স্থানকে একটি পাতলা রবারের চাদরের তৈরি টেবিলের উপরিভাগের সাথে তুলনা করা যেতে পারে (কল্পনা করুন আপনার ডাইনিং টেবিলের উপরটা কাঠের বদলে পাতলা রবার-চাদরের তৈরি)। একটি প্রায় ভরহীন বস্তু কণা চাদরটির উপর দিয়ে গমন করলে এর গতিপথ হবে সরলরৈখিক। কিন্তু একটি বেশ ভারী বস্তুখ (ধরা যাক একটি ভারী পাথর) যদি চাদরটির উপর রাখা হয়, তাহলে আচ্ছাদনটির আকার বিকৃত হয়ে যাবে, দেখতে হবে অনেকটা নীচের ছবির মতো।

যত ভারী পাথর চাপানো হবে, বক্রতাও বেড়ে যাবে সেই অনুপাতে। এখন একটি বস্তু কণিকাকে টেবিলের উপর ছেড়ে দিলে এর চলার পথও কিন্তু বেঁকে যাবে চাদরটির বক্রতার কারণে। বস্তু কণিকাটি গড়িয়ে পরতে চাইবে ভারী প্রস্তর খণ্ডের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। নিউটন এরই নাম দিয়েছিলেন মহাকর্ষ। আর আইনস্টাইনের দৃষ্টিতে কোনও টান নয়, বরং স্থানের বক্রতার কারণেই উদ্ভব হয় মহাকর্ষের। অর্থাৎ আইনস্টাইন উদ্ঘাটন করলেন মহাকর্ষ রহস্যের আসল চাবিকাঠি। এ তত্ত্বের আবেদন কিন্তু সুদূর প্রসারী। বিশাল ভরের উপস্থিতির কারণে একইভাবে অর্থাৎ রবার চাদরের অনুরূপ স্থানে সৃষ্টি হয় বক্রতা যা কোন বস্তু কণিকার গতিপথকে, এমন কি আলোক কণিকার পথকেও বাঁকিয়ে দিতে পারে।

আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য অবস্থান করায় এর আশপাশের স্থান জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে বক্রতা, যার কারণে পৃথিবীসহ অন্যান্য সকল গ্রহকে একটি বক্রতলে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে দেখা যায়। অধ্যাপক আর্কিবাল্ড হুইলারের ভাষায় বলা যায়, 'জড় স্থানকে বলছে কীভাবে বাঁকতে হবে, আর স্থান জড়কে বলছে কীভাবে চলতে হবে'। এটিই আসলে নিউটনীয় মহাকর্ষণকে আইনস্টাইনের চোখ দিয়ে দেখা।

তাহলে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব থেকে আমরা জানলাম- স্থূল বস্তু থেকে জড়কণা এমনকি আলোক কণাও মহাশূন্যের এই বক্রতার (মহাকর্ষের) কারণে প্রভাবিত হয়। ১৯১৫ সালে, তত্ত্বটি প্রকাশের পরপরই আইনস্টাইন বলেছিলেন যে, সূর্যের কাছাকাছি কোনও নক্ষত্র থেকে উদ্ভূত আলো সূর্যের পাশ ঘেঁষে পৃথিবীতে আসার সময় সূর্যের আকর্ষণের কারণে আলোর পথটি বেঁকে যাওয়ার কথা। ঠিক কতটুকু বাঁকবে তাও আইনস্টাইন গণনা করে দেখালেন যে আলো-পথটি আদি পথ থেকে ১.৭৪ সেকেন্ড চাপ (sec. arc) সরে আসবে সূর্যের দিকে। পরিমাণটি সামান্য, কিন্তু পরিমাপযোগ্য তো বটেই। কিন্তু সমস্যা হলো আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণী যাচাই করা নিয়ে। এর কারণও ছিল। সাধারণ অবস্থায় সূর্যের কাছাকাছি কোনও তারা খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল। সূর্যগ্রহণকালে যখন চাঁদের ছায়ায় সূর্য ঢেকে যায়, তখনই কেবল এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণ করে সত্য-মিথ্যা উদ্ঘাটন করা সম্ভব। তাই করা হলো। ১৯১৯ সালের ২৯ মে স্যার এডিংটনের নেতৃত্বে এক দল জ্যোতির্বিদ পশ্চিম আফ্রিকার কাছে প্রিন্সিপি নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে সূর্যগ্রহণের সময় নক্ষত্রালোকের এই বিসরণ (deflection) পরিমাপ করলেন। অন্য দলটি গিয়েছিল ক্রোমেলিনের নেতৃত্বে ব্রাজিলের সোব্রালে। উভয় স্থানেই ফলাফল কিন্তু আইনস্টাইনের ভবিষদ্বাণীর সাথে মিলে গেল প্রায় অক্ষরে অক্ষরে।

রাতারাতি আইনস্টাইন পৌঁছে গেলেন খ্যাতির শিখরে। তাঁর পূর্ববর্তী সকল অবদানের কথা মনে রেখেও বলা যায়- এই একটি মাত্র ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য তাঁকে তখনকার সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর আসনে পাকাপোক্তভাবে বসিয়ে দিল। ১৯২১ সালে আইনস্টাইন পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, তবে আপেক্ষিক তত্ত্বের জন্য নয়- দেয়া হয়েছিল আলোক-তড়িৎ প্রক্রিয়ার (photoelectric effect) সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য (১৯০৫)।

তাহলে মহাকর্ষ নিয়ে কোন বিরোধটা মিটালেন আইনস্টাইন ? আসলে ঠিক বিরোধ তো নয়, বলা যায় নিউটনের মহাকর্ষ নিয়মকে আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে আইনস্টাইন আরও ব্যাপকতা দিলেন। যখন বস্তুর গতিবেগ থাকে অল্প, অথবা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব থাকে সামান্য, তখন আসলে নিউটন এবং আইনস্টাইনের তত্ত্ব একই রকম ফলাফল দেয়। কোনও বিরোধ থাকে না। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে, যেমন সূর্যের কাছাকাছি অবস্থিত তারা থেকে আসা আলোর বিসরণ (deflection) নিউটনের নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, যা আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে বেশ সহজেই করা যাচ্ছে। বুধ গ্রহের কক্ষপথ নির্ধারণে নিউটনের নিয়ম কিছুটা ভুল ফলাফল দিচ্ছিল, আর তা তখনকার বিজ্ঞানীদের বেশ বিচলিত করে রেখেছিল। এ সমস্যা সমাধানে তারা সূর্য আর বুধের মাঝে আরেকটি গ্রহের অবস্থান কল্পনা করেছিলেন; এই অদৃশ্য গ্রহটির একটি নামও দেয়া হয়েছিল, 'ভালকান'। পরবর্তীকালে আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা বুধ গ্রহের সঠিক কক্ষপথ নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন। অদৃশ্যমান 'ভালকানে'র কল্পনা করার আর প্রয়োজন রইল না।

বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে ? কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক বিপ্লবের পর গ্যালিলিওর নভো-জ্যোতিষ্ক নিয়ে গবেষণা আর তার পর্যবেক্ষণ- পরবর্তীকালে নিউটনের গ্রহ-উপগ্রহের গতি নিয়ে সঠিক চিন্তা ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। নিউটন মহাকর্ষ ও গতির নিয়ম প্রয়োগ করে দেখালেন নভোম লের প্রতিটি বস্তু কণাই প্রকৃতির নিয়মের অধীন। আইনস্টাইন এসে মহাকর্ষের সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দিলেন স্থান-কালের বক্রতার (curvature of space-time) ধারণা উপস্থাপন করে। তিনি বললেন, মহাশূন্য, জড়পিণ্ডের উপস্থিতিতে অনেকটা হাল্কা রবার-চাদরের মত বেঁকে যায়, যার প্রভাব থেকে অতি দ্রুতগামী আলোক কণিকাও মুক্তি পায় না। ১৯১৯ সালে সম্পাদিত এডিংটনের পরীক্ষণ আইনস্টাইনের তত্ত্বের সত্যতাই প্রমাণ করল। গল্প কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বই পরবর্তীকালে কৃষ্ণ গহ্বরের অস্তিত্ব আর মহাবিশ্বের প্রসারণ সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা উপহার দিয়েছিল। উন্মোচিত হয়েছিল বিশ্ব রহস্যের আর এক আকর্ষণীয় অধ্যায়।◆